Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 180– 192
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

নলিনী বেরার জীবন ও নির্বাচিত সাহিত্য সাধনার একটি সমীক্ষা

সুনীতি সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : sarkar.suni88@gmail.com

Keyword
নলিনী বেরা, উপন্যাস, শবর চরিত, অপৌরুষেয়, প্রচ্ছদ, অঙ্কন, পরিচ্ছেদ।

Abstract
সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টার পরিচয় হলেও স্রষ্টার জীবন বৃত্তান্তের পরিচয় জানাও আবশ্যক। কেননা স্রষ্টার জীবনচরিতের বহুকথাই আড়ালে সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। একজন লেখক সারাজীবন ধরে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই খনন করতে চান। একজন লেখকের নিজের সময়, যাপন ও চারপাশের স্থানিক পরিসর, ভূগোল সৃষ্টিক্ষেত্রে নানাভাবে উঁকি দেয়। কবিকে কবির জীবনচরিতে পাওয়া যাবে না এও যেমন সত্য তেমনি কবিত্বের অপেক্ষা কবিকে বোঝা গুরুতর সেও সত্য। নলিনী বেরা যে ভূগোলে বড় হয়ে উঠেছেন, আত্মজৈবনিক উপাদান যেভাবে সাহিত্যের নন্দনভুবনে তুলে এনেছেন, পারিবারিক পরিসর যেমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে অবগত হলে সৃষ্টিভুবন বুঝতে সহায়ক হয়। নলিনী বেরার সমস্ত আখ্যানে তিনি নিজেই যেন উপস্থিত, কখনও লনিনী/ ললিনী নামের অন্তরালে তিনি জননী জন্মভূমির প্রতিমা গড়ে তোলেন। তেমনি নলিনী বেরার পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, সুবর্ণরেখা তীরবর্তী জনজীবনের ভূগোল সম্পর্কে অবগত হলেই স্পষ্ট হবে লেখক কেন সেই ভুবন বারবার ক্লান্তিহীনভাবে গড়ে তোলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতে নলিনী বেরা এক অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর জন্ম এক সাধারণ দরিদ্র কৃষক পরিবারে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা সীমান্তের কাছাকাছি সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভুঁইঞা-ভূমিজ-সাঁওতাল-লোধা-কামহার অধ্যুষিত 'বাছুর খোয়াড়' গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বেরা ও মাতার নাম ঊর্মিলা দেবী। একজন লেখক যে জনপদ থেকে উঠে আসেন, তার লেখালেখিতে সেই ছাপ পরে। তারপর পরবর্তী সময়ে লেখক যখন পরিণত হন, তখন তার লেখার মধ্যে শৈশবটাই বেশী করে থাকে- শৈশব মানেই একটা বৃহৎ ওর জীবন ও সত্ত্বা যেটা তাঁর শৈশব যেটা অনেক বড় এবং মনে করা হয় যে লেখকের শৈশব যত বড় সে তত বড় লেখক।

নলিনী বেরার প্রথম উপন্যাস 'ভাসান'। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'দুই ভুবন' গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থে দুটি উপন্যাস রয়েছে 'ভাসান' ও 'ভাসমান'। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন রঞ্জন দত্ত। নলিনী বেরার স্মরণীয় উপন্যাস 'শবর চরিত' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। এখনও পর্যন্ত নলিনী বেরার আখ্যানভুবনে সর্বাধিক পৃষ্ঠা সংখ্যার উপন্যাস 'শবর চরিত'। 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন দেবাশিস সাহা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন দেবেশ রায়কে। উপন্যাসটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রতিটি পরিচ্ছেদ আবার উপ পরিচ্ছেদে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। নলিনী বেরার 'কুসুমতলা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন দেবাশিস

রায়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন সহলেখক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে। নলিনী বেরার 'পাঁচকাহানিয়া' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছেদ অঙ্কন করেন দেবাশিস সাহা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'দে'জ পাবলিশিং'এর শুভঙ্কর দে'কে। উপন্যাসটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। লেখক জানিয়েছেন 'পাঁচকাহানিয়া' কোনো গ্রামের নাম নয়, এটি একটি জঙ্গল।

Discussion

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টার পরিচয় হলেও স্রষ্টার জীবনবৃত্তান্তের পরিচয় জানাও আবশ্যক। কেননা স্রষ্টার জীবনচরিতের বহুকথাই আঁড়ালে সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। একজন লেখক সারাজীবন ধরে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই খনন করতে চান। একজন লেখকের নিজের সময়, যাপন ও চারপাশের স্থানিক পরিসর, ভূগোল সৃষ্টিক্ষেত্রে নানাভাবে উঁকি দেয়। কবিকে কবির জীবনচরিতে পাওয়া যাবে না এও যেমন সত্য তেমনি কবিত্বের অপেক্ষা কবিকে বোঝা গুরুতর সেও সত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই দুই মন্তব্য মাথায় রেখেও স্বীকার করতে হয় কবি/লেখকের জীবনবৃত্তান্ত জানা জরুরি। একজন লেখক কখনও নিজেই চরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। যেমন ধরা যাক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের শিবনাথ। তেমনি একজন লেখকের জীবন সম্পর্কিত ধারণা, রাজনীতি, জীবনদর্শন জানা আব্যশক হয়ে ওঠে সাহিত্যভুবনে প্রবেশের আগে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসর না জানলে সাহিত্যেভুবনে প্রবেশ করা কিছু কঠিন হয়। কেননা পার্টি রাজনীতি তাদের জীবনে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে বলেই সাহিত্যের ভুবনে কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও মার্ক্সীয় চেতনা নানাভাবে প্রকাশ করেছে। তেমনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপধ্যায় সহ সৈকত রক্ষিতদের জীবনবৃত্তান্ত জানলেই অবগত হওয়া যায় কেন সাহিত্যভুবনে সেই সত্যগুলি উঠে এসেছে। ব্যতিক্রম নয় কথাকার নলিনী বেরাও। নলিনী বেরা যে ভূগোলে বড় হয়ে উঠেছেন, আত্মজৈবনিক উপাদান যেভাবে সাহিত্যের নন্দনভুবনে তুলে এনেছেন, পারিবারিক পরিসর যেমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে অবগত হলে সৃষ্টিভুবন বুঝতে সহায়ক হয়। নলিনী বেরার সমস্ত আখ্যানে তিনি নিজেই যেন উপস্থিত, কখনও লনিনী/ ললিনী নামের অন্তরালে তিনি জননী জন্মভূমির প্রতিমা গড়ে তোলেন। তেমনি নলিনী বেরার পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, সুবর্ণরেখা তীরবর্তী জনজীবনের ভূগোল সম্পর্কে অবগত হলেই স্পষ্ট হবে লেখক কেন সেই ভুবন বারবার ক্লান্তিহীনভাবে গড়ে তোলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতে নলিনী বেরা এক অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর জন্ম এক সাধারণ দরিদ্র কৃষক পরিবারে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা সীমান্তের কাছাকাছি সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভুঁইএ্যা-ভূমিজ-সাঁওতাল-লোধা-কামহার অধ্যুষিত 'বাছুর খোয়াড়' গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বেরা ও মাতার নাম ঊর্মিলা দেবী। তাঁর পিতামহের কৈলাসচন্দ্র বেরা ও পিতামহীর নাম অঞ্জনা সুন্দরী। তাঁর বাল্য শিক্ষা শুরু হয়েছিল গ্রামের পাঠশালায়। দরিদ্রের ঘরে সেকালে বিদ্যাশিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব ছিল, নলিনী বেরার ভাগ্যেও তার থেকে বেশি কিছু জোটেনি। কিন্তু তাঁর মধ্যে নিজের আগ্রহ ও প্রতিভার জোরে তিনি পুঁথিগত শিক্ষাতে এগিয়ে গিয়েছেন।

'রোহিনী' গ্রামের 'চৌধুরানী রুক্মিণী দেবী হাইস্কুল' থেকে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে তিনি ১৯৬৮ সালে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর তিনি 'বাংলা-অনার্স' নিয়ে ভর্তি হন মেদিনীপুর কলেজে। এর ঠিক তিন মাস পর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ডি. ফিল করে আসা প্রীতম নামক একজন অধ্যাপকের পরামর্শে আবার ফিজিক্স নিয়ে ভর্তি হন। এই সময় মেদিনীপুর কলেজে বাংলা বিভাগের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন মনমোহন দত্ত। শ্রদ্ধেয় বাংলার অধ্যাপক একদিন তাকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন-- তোমার ভব্যতার অভাব হয়েছে। ছ'মাস ফিজিক্স পড়াকালীন একদিন আচমকা বোমাবাজিতে তিনি মেদিনীপুর ছেড়ে পুনরায় নদী পারে তাঁর নিজের বাড়িতে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যান ঝাড়গ্রাম শহরে। এখানে তিনি 'অর্থনীতি' অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। ১৯৭১ সালে তিনি অর্থনীতিতে স্নাতক হন। এরপর ১৯৭৫ সালে স্টাটিকস্টিক নিয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। ১৯৭৮ সালে ডবলিউ.বি.সি.এস পরীক্ষায় এ গ্রুপে

উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের পদস্থ আধিকারীক হিসেবে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি কলকাতা পৌরসভার বিচারক হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

একজন লেখক যে জনপদ থেকে উঠে আসেন, তার লেখালেখিতে সেই ছাপ পরে। তারপর পরবর্তী সময়ে লেখক যখন পরিণত হন, তখন তার লেখার মধ্যে শৈশবটাই বেশী করে থাকে- শৈশব মানেই একটা বৃহৎ ওর জীবন ও সত্ত্বা যেটা তাঁর শৈশব যেটা অনেক বড় এবং মনে করা হয় যে লেখকের শৈশব যত বড় সে তত বড় লেখক। যদি সে সেটাকে ঠিকঠাক ধরতে পারে। নলিনী বেরার নিজের ভাষায়-

> "তো আমাদেরও ঠিক ছেলেবেলায় লেখক হব বলে জানি না, এ ভাবনাও ছিল না কোনোদিন কিন্তু কোথাও যেন কিছু একটা কাজ করত আর কি কোথায় যেন দেখার চোখ একটু অন্যরকম ছিল তাও বুঝতে পারতাম না। আমাদের গ্রামটার কথা বলি। এই গ্রামটি একটি ঐতিহাসিক গ্রাম বলতে গেলে ইতিহাস নিয়েই কিছুটা। অস্তিত্বহীন গ্রাম। গ্রামের ধারে বহমান সুবর্ণরেখা নদী। আমার খুব প্রিয় নদী। তো সেই নদীপারে দক্ষিণ তীরে আমাদের গ্রামটা ছিল একটা উঁচুর মধ্যে। নদী হয়ত তার কাছে ছিল না, ভাঙতে ভাঙতে তার কাছে চলে এসেছে। সম্ভবত এভাবেই টিলাগড়ে উঠেছে। সেই টিলার উপরে আমাদের গ্রামটা বেশ বড় গ্রাম, বর্ধিষ্ণু। এপাশে নদী, ওপারে জঙ্গল, জঙ্গল বলতে ছেলেবেলায় দেখেছিলাম বেশ জঙ্গল। আমাদের ভাষায় সেটাকে বলে ওঝোঝ'। ওঝোঝ' মানে 'ঘন জঙ্গল'। এখন হয়তো অনেক গাছ-টাছ কেটে নিয়েছে। ফাঁকা হয়ে আসছে। কিন্তু সেই ওঝোঝ জঙ্গল এবং সেটা প্রায় ওড়িশা সীমান্ত বরাবর মানেজঙ্গলটা পেরোলেই ওপাশে ওড়িশা। এমন একটা অবস্থান যেখানে জন্মেছিএকদিকে নদী আর একদিকে ঘন জঙ্গল। মাঝখানে ঠিক আমাদের গ্রামটা।"[১]

লেখকের ছোটবেলায় বর্ষাকালে যখন তুমুল বৃষ্টিপড়ত তা ঘরের চাল ভেদ করে ঘরে ঢুকে যেত। মাটির ঘরে বৃষ্টির জল পড়ে চারিদিক কাদাকাদা হয়ে যেত, তখন তিনি দেখতেন তাঁর মা কাকিমারা কাসাবাটি সহ সমস্ত জল ধরে রাখার যা যা পাত্র সব এখানে সেখানে পেতে দিতেন। বৃষ্টির ফোটা ফোটা জল যখন ঘরের চাল দিয়ে ওই বাটিগুলোতে পড়ত তখন লেখকের মনে হত যেন জলতরঙ্গ বাজনা বাজছে। সেই সুর তার অদ্ভুত ঠেকত। রাত্রিবেলা হলে বেশী শোনা যেত এই আওয়াজ। বৃষ্টি পড়লে আশেপাশে কোনো ঘর বা বাড়ি আছে বলে তাঁর মনে হত না। দিনের বেলা যখন বৃষ্টি হত তখন তাদের উঠোনে তাদের মুরগিগুলো উঠে আসত। বৃষ্টির সময় কোনো কোনো দিন হেলে সাপ (লেখকের ভাষায় 'হেলহেলিয়া সাপ') এর মণ্ড পড়ত। বিষহীন ছোটো ছোট সাপের মণ্ড কোথা থেকে পড়ত কেউ জানে না। ওই মুরগিগুলো তখন ছোট ছোট সাপগুলোকে খেত। এটি ছিল একটি মজার দৃশ্য লেখকের কাছে যা তাঁর মুখ থেকে শোনা।

নলিনী বেরার ঠাকুরমা বেঁচে ছিলেন প্রায় ১০৫ বছর পর্যন্ত। তারা পিসতুতো জ্যাঠাতো কাকাতো ভাইবোন মিলে মোট ৩১ জন ছিলেন। সবাই প্রায় একসাথে বড় হয়েছিলেন। তাঁর বাবারা চারভাই, এদের সন্তান এবং দুই পিসি ও তাঁদের সন্তানরা একত্রেই থাকতেন। সবাই মিলে একসঙ্গে বর্ষার রাতে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনার মজাই আলাদা। তাঁর ঠাকুরমা প্রায়ই গল্প করতেন একটা বেঁটে মানুষের। ঠাকুরমার সেই বেঁটে লোকটির গল্পটি লেখকের নিজের ভাষায় কিছুটা এই রকম—

> "বেঁটে বাটকুল যখন রাজকুমারীকে তুলে নিয়ে যেত তখন যাবার পথে রাজকুমারী ঘোড়ার লেজে সরষে বেঁধে দিত। ঘোড়া দৌড়ালে সরষের বীজ ঝুরঝুর করে মাটিতে পড়ত। রোদ-বৃষ্টিতে সেই বীজ অঙ্কুরোদগম হত, তাতে হলুদ হলুদ সরষে ফুল ফুটত। তখন রাজপুত্র সেই হলুদ ফুল দেখে দেখে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যেত।"[২]

লেখকের নিজের ভাষায়-

> "আমাদের ওই অঞ্চলে এখনও এই গল্পগুলি মিথ হয়ে আছে। আমার নিজেরই একটা গল্প আছে 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা।"[৩]

আবার লেখক নিজের গ্রাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন-

> "তবে আমার গোড়া থেকে মনে হত গ্রামটা যেন Outsider। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটা দেশের মতো মনে হত। যেখানে বর্ষাকাল হলে আমরা নদী পারও হতে পারতাম না। অন্যান্য সময় একটা নৌকা থাকত নদীপার হবার জন্য। এপারের ভরা নিয়ে ওপারে আর ওপারের ভরা নিয়ে এপারে ফিরে আসত। আমাদের গ্রামের ওপারে আবার ঘন ওড়িশার জঙ্গল। তখন জঙ্গলে থাকত বাঘ-ভাল্লুক-হায়না। এখন তা আর দেখা যায় না। আমাদের ওই নদী তীরে যে গ্রামগুলো সেখানে যখন বর্ষার প্লাবন আসতো তখন গ্রামগুলো প্রায় ডুবে যেত। তখন একদল মানুষ গরু-বাছুরগবাদি পশু নিয়ে উঠে আসত আমাদের স্কুল মাঠে। তারাও এক ধরনের উদ্‌বাস্তু। স্কুল ঘরগুলোতে তারা আশ্রয় নিত। তখন চারিদিকে জীবনের কলরব যাকে বলে, আর্ত মানুষের কলরব হাহাকার বলব না একে।"[৪]

লেখকের গ্রামে তখনও সভ্যতার আলো ঠিকঠাক ভাবে জ্বলেনি। গ্রামে তখন শিক্ষিত বলতে একজনই ছিলেন, তিনি হলেন লেখকের ছোট কাকা। তিনি নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনো করেছিলেন। তারপর তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। লেখক যখন ক্লাস ফাইভ-সিক্স এ পড়তেন তখন তার কাকা যৎসামান্য লেখাপড়ার ফলে একটি হোমগার্ডের চাকরি পেয়েছিলেন। এই ছোট কাকাকে নিয়েই লেখকের লেখা গল্প 'হোমগার্ডের জামা'।

দুপুরবেলা গ্রামে এক সাধুবাবার আসার গমগম আওয়াজ পাওয়া যেত, যাকে তারা ভাট ভিক্ষারী বলতেন। যখন সাধুবাবা গ...গ... আওয়াজ করে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতেন তখন মা কাকিমারা ভিক্ষা দেওয়ার জন্য যেতেন এবং পেছন পেছন লেখক ও তাঁর দলবলেরাও ছুটত। শীতকাল, অগ্রহায়ণ, পৌষমাসে গ্রামে বাজিকরেরদল, যাযাবরের দল আসত। তাঁরা বাঁদর, ছাগল, গাধা নিয়ে আসত। তাদের পোশাক আশাক ছিল একটু অন্যরকম। তাদের মেয়েরা বড় বড় নানা রঙ-বেরঙের ঘাগড়া পড়ত। তারা স্কুলের সামনে একটি বড় বটগাছের নীচে বাসা বাঁধত। পাথর দিয়ে উনুন বানিয়ে সেই উনুনে পাখি পুড়িয়ে তা খেত। বটগাছের ডালে যত বাদুর ঝুলে থাকত তারা তা শিকার করে ছাল ছাড়িয়ে মাংস রান্না করে খেত। লেখক একদিন দেখে একটি বাচ্চা মেয়ে শুধু একথালা ভাত নিয়ে খাচ্ছে, তাকে শুধালে লেখক তার অঙ্গভঙ্গিতে বুঝতে পারে যে সে মাংস খায় না। বাচ্চা মেয়েটির টানে লেখক বারবার সেই স্কুল গেটের সামনে ছুটে যেতেন। লেখকের নিজের ভাষায়—

> "বানজারারা চলে গেলেও তাদের সেই গন্ধ আমাকে এখনও তাড়িয়ে বেড়ায়। এমনকি ধর্মতলার ওই জনারণ্যে তখনও হঠাৎ করে সেই গন্ধ নাকে আসে। এই পিছন ফিরে তাকালে যে সব দেখতে পাই সেগুলোই আমাকে লেখার প্রেরণা জোগায়।"[৫]

নলিনী বেরা যখন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তেন তখন কিশলয়ের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাল তমাল', শকুন্তলার গল্প', 'দাতাকর্ণের আশ্রম'তাঁর প্রায় মুখস্থ। এগুলোর লেখক কে তাঁদের প্রতিনলিনীবাবুর আকর্ষণ থাকত না। কিন্তু গল্পাংশগুলোতাঁর অসাধারণ লাগত। তিনি আরও যখন বড় হলেন আরও বিভিন্নভাবে গ্রাম ও গ্রাম্য জীবনকে উপভোগ করতে লাগলেন। এই সময় হঠাৎ তাঁর ছোট কাকা হোমগার্ডের চাকরি ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে বেড়াত। সেই গানগুলো তিনি মন দিয়ে শুনতেন। সেই গানগুলোয় কোথাও যেন একটা বিষাদের করুণ সুর জড়িয়ে থাকত বলে তার মনে হত। এইসময় লেখকের এক জ্যাঠাতো দাদা সন্তোষদার বিয়ে হয়ে গেল। সে হাটে যেত জিনিসপত্র বেচাকেনা করতে। হাটে থেকে ফিরে আসার সময় বাকে করে নিয়ে আসত একদিকে কলমিশাক আর একদিকে থাকত লাল শালুতে মোড়া রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি। এইভাবেই হঠাৎ একদিন সন্তোষদার হাতে করেই লাল শালুতে মুড়ে তাঁদের গ্রামে প্রথম ঢুকেছিল 'বাৎসায়নের কামসূত্র'। লেখকের ভাষায়—

> "বড়রাও যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে এটি পড়ল, তেমনি গ্রামে যারা একটু আধটু লেখাপড়া করত তারাও লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। এক চাপা গুঞ্জনে বই প্রায় কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল।"[৬]

গ্রামের পশ্চিমে দুটো স্কুল ছিল—একটা প্রাইমারী আর একটা জুনিয়র হাইস্কুল। দুটো স্কুল মিলে একসাথে একটাই সরস্বতী পুজো করত খুব ধুমধাম করে। এরপর এই দুই স্কুলে পড়াশুনো শেষ করে নদী পেরিয়ে রোহিনী গ্রামের স্কুলে তিনি ভর্তি হন। টিনের ছাউনি দেওয়া মাটির তিনতলা স্কুল হোস্টেলে তিনি থাকতেন। হোস্টেলের পাশেই ডুলুং নদী। এই নদীপারে আখের খেত, তাল চড়ুইরাহুর-হার ফুর-ফার করে ওড়াওড়ি করত। ডুলুং নদীর জলের শব্দ আর তার জলে মাঝে মাঝে চ্যালা-খয়রা-বাটা মাছের লাফিয়ে ওঠার রূপালী ঝলকে তাঁর মন হোস্টেলের বন্দী ঘরের

মধ্যে ছটফট করত। তারপর এখান থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে মেদিনীপুর কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে তিনি ভর্তি হন। সেখানকার অধ্যাপিকা কস্তুরীদি প্রথম দিনেই লিখতে দিয়েছিলেন ‘ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারেবারে দয়াহীন সংসারে’ ‘প্রশ্ন’ কবিতার সারমর্ম, কে কত তাড়াতাড়ি লিখতে পারে। তিনি সেদিন ফাস্ট হয়ে গেলেন ক্লাসে সেই কবিতার সারমর্ম লিখে। তখন বীতশোক ভট্টাচার্য সেই কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ছেন এবং‘দেশ’ পত্রিকায় একের পর এক কবিতা লিখে খ্যাতনামা হয়েছেন। তাঁর সংসর্গে এসে নলিনী বেরার মধ্যেও একটা কবি হওয়ার সুপ্ত বাসনা জাগল। কলেজের বাংলার ‘হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট’ মনমোহন দত্ত তাঁর অবস্থা বুঝে গোটাকতক টিউশনি জোগাড় করে দেন। কে ডি কলেজের কাছেই ‘সরাভাই কেমিক্যাল’ এর কেমিস্টের মেয়ে গোপা রায়কে পড়াতেন তিনি। ডি-ফিল করে আসা অধ্যাপক প্রীতম মহাশয়ের পরামর্শে বাংলা ছেড়ে ফিজিক্স নিয়ে ভর্তি হন। তখন বাংলায় বড়ই দুঃসময় চলছিল, পরিস্থিতি ছিল টালমাটাল। রাজাবাজার মেসের পূর্ণেন্দুজানা বারবার ফিজিক্সের থিয়োরি পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টের নাম্বার পেয়েও প্র্যাকটিক্যালে ফেল করছিলেন। এর ঠিক ছ'মাসের মাথায় আচমকা বোমাবাজিতে একদিন ফিজিক্সের ল্যাবরেটরিতে সবকিছু ছেড়ে তিনি পুনরায় দেশের বাড়ি ফিরে আসেন। লেখকের ভাষায়-

> "আচমকা বোমাবাজিতে একদিন ফিজিক্সের ল্যাবরেটরিতে সেই জাপানি পাইলট পেনটাকে, কে ডিকলেজের কাছের বাড়িতে গোপা রায়কে আর ‘রাজাবাজার মেস’-এর বোর্ডারদের নামে ‘পুলিশী ওয়ারেন্ট’ গচ্ছিত রেখে চিরতরে মেদিনীপুর ছেলে নদীপারের ছেলে নদীর এ-পারে ফিরে এলাম!"[৭]

একবছর পর বইপত্র সঙ্গে করে ঝাড়গ্রাম শহরে গিয়ে ওঠেন। এরপর ঝাড়গ্রাম কলেজে অর্থনীতি নিয়ে ভর্তি হন। ঝাড়গ্রাম শহরে মাঝে মাঝে শালগাছ, সাঁইবনি ঝোপ। তিনি তা দেখে খুব খুশি হন আর বলেন—

> "জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া। থুড়ি জিরানিয়া নয় ঝাড়গ্রাম আ গেয়া।"[৮]

মনে মনে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন— আর কিছুই তিনি হারাবেন না, প্রয়োজনে এই শহরের মাটি কামড়ে তিনি পড়ে থাকবেন। দরকার পড়লে কারোরবাড়ির খাটা-পায়খানা পরিস্কার করার কাজ নেবেন অথবা রাস্তায় ঝাড়ুদারের কাজ নেবেন তবুও ভালো। এরপর ঝাড়গ্রাম থেকে স্নাতক পাশ করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় থাকাকালীন খুব দৈন্য দশার মধ্য দিয়ে তিনি জীবন চালাতেন। তাঁর ‘শেষ কোথায়?’ গল্পে নিজের দারিদ্র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "নিজের জেদ ও চেষ্টার ফলেকীভাবে একজন সাধারণ গ্রাম্য ছেলে একজন সফল মানুষ হয়ে উঠেছেন।"[৯]

তিনি কলকাতায় থাকাকালীন একসময় জগন্নাথের পাইস হোস্টেলে খাবার খেতেন। তিনি জগন্নাথকে বলেছিলেন যে—

> "মেদিনীপুরের পৃথ্বীরাজ সিংমান্ধাতার আমল থেকে আমাদের জমিদারি। এখনও এস্টেটের আয় বছরে দশ লক্ষ টাকা।"[১০]

ওড়িষ্যার লোক বলে জগন্নাথ রাজা-রাজরা জমিনদার-জোতদারের ব্যাপারটা ভালোই বুঝত। তাঁকে জমিদার-জোতদারের ছেলে ভেবে খুব খাতির করত জগন্নাথ। তিনি পাইস হোটেলে খাবারের পয়সা একেবারে মাসে শেষে একসাথে দিতেন। কিন্তু ক্রমে দেখা যায় তিনি খাবারের টাকা দিতে দিতে পরের মাসের ২০/২৫ তারিখ করে দিচ্ছেন। ব্যবসায়িক জগন্নাথের বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। তিনি মাসিক টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা তুলে দেন। তারপর একদিন তাঁর খুব খিদে পাওয়াতে জগন্নাথের হোস্টেলে গিয়ে খাবার চাইলে জগন্নাথ প্রথমে টাকা চায়। নলিনীবাবু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর ODBL (Origin and Development of Bengali Language) জগন্নাথের হাতে তুলে দিয়ে এর বিনিময়ে খাবার চান। জগন্নাথ পুরো ODBL হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে তাকে বলে যে এই বইটি নিয়ে সে কি করবে? এই বইটির দাম এক পয়সাও হবে না। তখন নলিনীবাবু রাগে দুঃখে অভিমানে খিদের সেখান থেকে বেড়িয়ে আসেন। লেখক নিজের ভাষায় তিনি এই কাহিনী আলোচনা করে বলেছেন-

> "একদিন গ্রীষ্মের রাত। পকেট ঠনঠনে। একটা খোলামকুচিও নেই। খুরুট ব্যায়াম সমিতির ফুলবাগানে হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুর। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। এসব দেখে তো পেট ভরবে না আর। সোজা জগন্নাথের হোটেলে ঢুকে গেলাম। জগন্নাথ হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে ঢুলছে। তার হাতে সুনীতি চ্যাটার্জির ‘ও-ডি-বি-এল’বইটা

গছিয়ে দিলাম। 'বইটা রেখে আজকের মতো খেতে দিন'। বলতেই জগন্নাথ সোজা হয়ে বসল। উল্টেপাল্টে দেখলবইটা। রামায়ণ মহাভারতের মতো একটাও ছবিও নেই। ওপর নীচ বইটার ওজন করে দেখল। তারপর 'ও-ডি-বি-এল' ফেরত দিয়ে বলল, এর দাম কী! খবরের কাগজ নয় যে বাজারে বিক্রি করলে একটা মিলের দাম উঠে আসবে!'

জগন্নাথের কথায় ভয়ানক রেগে হোটেল ছেড়ে চলে এসেছি। সুনীতিবাবুর 'ও-ডি-বি-এল-এর বিনিময়েও একমুঠো খেতে দেয়নি জগন্নাথ।"[১১]

আবার হাওড়ায় বাড়ি ভাড়া করে থাকাকালীনও লেখক অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। হাওড়ায় লেখক আরও দুজনের সাথে একটি ঘরে ভাড়া থাকতেন। সেখানে দুজনের মধ্যে একজন রেশনের দোকানের কর্মচারী ছিলেন। একদিন ঘরে কেউ না থাকাকালীন খিদের জ্বালায় তিনি থাকতে না পেরে সেই রেশনের দোকানের কর্মচারীর চাল থেকে একমুঠো চাল নিয়ে খেতে যান আর তখনই সেই লোকটি হঠাৎ ঘরে চলে এসে সেই ঘটনা দেখতে পেয়ে লেখককে অকথ্য গালিগালাজ করে। এই ঘটনাগুলো লেখকের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।

এক সময় কলকাতায় দু'চারটে টিউশনি পেয়েছিলেন তিনি। হাওড়া থেকে কলকাতা ফিফটি টু নম্বর বাস চলত। তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা এমন ছিল না যে তিনি বাসে চরে চলাফেরা করবেন ফলত তিনি পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। পাশ দিয়ে হেসে খেলে গড়িয়ে যেত ফিফটি টু নম্বর বাসটা। তিনি দেখে শুনে বলতেন— "যাও টা-টা করে দিলাম।"[১২] কোন কোনদিন একরাশ ধুলো তার মুখের ওপর আছড়ে দিয়ে বলত— 'ফ্যাকলু কাঁহাকা!'[১৩] তার রাগ হত, তিনি বলতেন, 'ফিফটি টু নম্বর তোমার বেড়ে গুমর!'[১৪] সেবার পুজোতে একটা নীল রঙের প্যান্ট ও বুক পকেটে গোলাপ ফুল আঁকা একটি হালকা গোলাপী রঙের শার্ট হয়েছিল তাঁর। এগুলো পরেই তিনি সব জায়গায় চলাফেরা করতেন। একদিন তাঁর গ্রামের লোক– নৃসিংহবাবুর বাড়ি থেকে ফেরার সময় হাওড়া ব্রীজের একাধারে একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন, চিংড়িমাছের খোলের মত তার রঙ এবং উদোম বিবস্ত্র। তাই দেখে তার হড়হড়িয়ে বমি আসে এবং মাথা ঘুরতে থাকে, আর চলতে পারেন না তিনি। এই সময় ফাঁকা দেখে ফিফটি-টু নম্বর বাসে তিনি উঠে যান। বেশ আরাম করে জাঁকিয়েই বসেছিলেন তিনি। বাস ছুটছে, বেশ ফুরফুরে হাওয়ায় বমি বমি ভাবটা ছিল না। কনডাক্টর এসে দু'চারবার টিকিট চেয়ে গেছে। তিনি বেশ উঁটছে বলেছেন– 'মোশাই ওসব টিকিট ফিকিট হয়ে গেছে।'[১৫]

এরপর গোল বাঁধল শ্যামশ্রী মোড়ে বাস থেকে নামতে গিয়ে। টিকিট ফেরতে চাইলে পকেট হাতড়ে তিনি বলেন- 'ছিল তো। নেই এখন, হারিয়েছি'।[১৬] বলেই বাস থেকে নেমে দু'পকেটে হাত রেখে দ্রুতপদে গলির ভেতর ঢুকতে গেলেন কিন্তু নির্দয় কনডাক্টর বাঁ হাতের কনুইটা হিঁচড়ে টেনে অজস্র পথচারীর মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলল,

"ছি মশাই, দামী টেরিটের প্যান্ট-শার্ট পরে বাবু সেজেছেন, অথচ বাসের ভাড়া দেওয়ার দশটা পয়সা নেই?"[১৭]

বলেই পাষণ্ড লোকটা সজোরে ধাক্কা দিয়ে গলির ভেতর ঢুকিয়ে দিল তাঁকে। সেই থেকে অজস্র রাগ জমেছে লেখকের তার উপর। এইসব ছোটখাট রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাপ-পুণ্যবোধ থেকেই নলিনী বেরার লেখালেখি। লেখক নিজেই বলেছিলেন-

"আমার গল্পের বেশীরভাগ অংশই সত্য।"[১৮]

নলিনী বেরার প্রথম গল্প 'বাবার চিঠি', যা প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। যা লেখককে রীতিমত পরিচিতি এনে দেয়। এমনকি নলিনী বেরার আখ্যানভুবন যে স্বতন্ত্রবলয়ে প্রবেশ করবে তা এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। গল্পটি আত্মজৈবনিক উপাদানে ভরপুর। বলা ভালো লেখকের পারিবারিক জীবনের গল্প। দারিদ্রতার চিহ্ন বাক্যের শরীরে নানাভাবে মিশে আছে। বাবা হারানোর যন্ত্রণা, মাতার বেদনা, শৈশব, অভাব সব যেন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। সংসারে অভাব বলে পিতা-মাতার নিত্য কলহ চলত। কলহ থেকে রক্ষা পেতে পিতা অনেক সময়ই ভিন্ন গ্রামে চলে যেতেন। আবার কিছুদিন পরে ফিরে আসতেন। তেমনই একবার ঘটেছে। পিতা ফিরে এসে স্ত্রীর খোঁজ করছেন। গোটা পাড়া খোঁজেও মাতার সন্ধান পাননি লেখক। অথচ কৌতূহল পিতা কী এনেছে। সাধারণ জামা প্যান্টে দারুণ খুশি।

এরপর পড়তে গিয়েছেন শহরে, থাকেন হোস্টেলে। পিতা অসুস্থ। হাটের লোকেদের কাছে পিতার খবর নেন। একদিন পিতা চলে যান। দশরথ হোস্টেলে গিয়ে লেখককে নিয়ে আসে। সে বলেনি পিতা মারা গেছেন। বাড়ির সামনে এসে জানিয়েছেন। শহরের হোস্টেল থেকে গ্রামে আসতে যে যাত্রাপথের বিবরণ লেখক চিহ্নিত করেছেন তা অপূর্ব। চিত্ররূপময় গ্রাম্যজীবনের জলজঙ্গল পরিবৃত্ত, সাধারণ অভাবী অথচ স্নেহ আন্তরিকতায়পূর্ণ মানুষগুলির যে ছবি ফুটে ওঠে তা স্বতন্ত্র। পিতা চলে যাওয়ার পর মাতা সংসার আগলে রেখেছে। পিতার লাগানো কুমড়ো খেতে ফল দেখে মাতার হৃদয়ে স্বামীর স্মৃতি ধরা দিয়েছে। তেমনি আজ লেখক শহরে থেকেও স্মৃতিতে বাবার কথা মনে পড়ে। সেই অনুভূতির সঞ্চার করেছেন গল্পে মায়াবী ভাষায় ও স্মৃতিকাতরতায়।

নলিনী বেরার 'চোদ্দমাদল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন অমিতাভ চন্দ্র। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন ছোটকাকা ও ছোটকাকীমাকে। প্রসঙ্গত বলা ভালো লেখকের বহু গল্পে ও উপন্যাসে ছোটকাকার প্রসঙ্গ এসেছে। উপন্যাসটি চোদ্দটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তবে প্রথম ও শেষে দুটি নামচিহ্নিত পরিচ্ছেদ রয়েছে। সে দুটি পরিচ্ছেদ ধরলে ষোলটি পরিচ্ছেদ। উপন্যাসের নাম যেহেতু চোদ্দমাদল তাই লেখক চোদ্দটি পরিচ্ছেদ রেখেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'বাঁশিটি মোর', শেষ পরিচ্ছেদের নাম 'মানগোবিন্দপুরের যাত্রী'। গ্রাম বাংলার লোকায়ত উৎসব হরিনাম সংকীর্তন। সেই হরিনাম সংকীর্তনকে সামনে রেখে চোদ্দটি পরিচ্ছেদে জন্মভূমির মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার-ভক্তি-ঈশ্বরপ্রেম-কোলাহল-ঐক্যের নানা কথা লেখক শুনিয়েছেন। সমস্ত উপন্যাসের মতো এখানেও লেখকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। লেখক শহর থেকে গ্রামে ফিরেছেন। বাগালবউ হাসতে হাসতে লেখককে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেছে। লেখক বুঝে উঠতে পারেনি হাসির কারণ। গিয়ে দেখেন মাদল নিয়ে পিতা-পুত্র (শম্ভু-তিলোকচাঁদ) ধস্তাধস্তি করছে। শম্ভু মাদল সারিয়ে এনেছে। ইচ্ছা আজ যাত্রাদলে সকলের সঙ্গে মাদল বাজাবেন। কিন্তু পুত্র অধিকার ছাড়তে নারাজ। এইভাবে আখ্যানভূমিতে প্রবেশ করেন লেখক।

নলিনী বেরার দুইখানি কাব্য ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে কথাসাহিত্যে আশ্রয় নিলেও মাঝেমাঝে মনের খেয়ালে কাবিতা রচনা করেন। নলিনী বেরার 'সে জানে শুশনি পাতা' কাব্যটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি উৎসর্গ করেন পিতা মাতাকে। কাব্যে ৬৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। মিহিবুননে, মায়ামায় বিন্যাসে নিজের জীবনের কথাই নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বহু কবিতায় তিনি নিজেই উপস্থিত থেকেছেন। জন্মভূমি ও জন্মভূমির মানুষজন. ভূগোল, নদী বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। কোথাও কোথাও জননী-জন্মভূমি এক হয়ে যায়। প্রথম কবিতা 'টেলিফোন', শেষ কবিতা 'সে জানে শুশনি পাতা'। 'সুবর্ণরেখা' কবিতায় নদী ও মাতা একাকার হয়ে গেছে। যে সুবর্ণরেখা নামাঙ্কিত উপন্যাস লেখককে খ্যাতি এনে দিয়েছে সেই নদীই যেন মাতার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে কবিতায়। কবিতাটি প্রাসঙ্গিক বলে কিছুটা এখানে তুলে ধরা গেল—

"সুবর্ণরেখা যদি বা নদীর নাম আমারো মায়ের ওই নাম ছিল
বাবা ত নিয়ত মাকে ওই নামে ডেকে যাবতীয় কথা
কুলকুচোর মতো ফেলে রেখে চলে যেত নদীটার দিকে
নাকি সে-নদীর রূপ মা আমার ধরেছিল বস্তুত জীবনে
আমি ভাবি নদীই জননী ছিল নদী তো মায়ের মতো হয়"[১৯]

নলিনী বেরার প্রথম উপন্যাস 'ভাসান'। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'দুই ভুবন' গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থে দুটি উপন্যাস রয়েছে 'ভাসান' ও 'ভাসমান'। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন রঞ্জন দত্ত। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন প্রমথদাকে। উৎসর্গপত্রে দুইবার 'আমার' শব্দের ব্যবহার ও মাতৃভূমি, গ্রামের উল্লেখের মধ্য দিয়ে স্বজন-স্বভূমির প্রতি লেখকের অনুভব ব্যক্ত হয়েছে। 'ভাসান' উপন্যাসে কোনো পরিচ্ছেদ নেই, কিন্তু ভাসমান উপন্যাসটি চব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এমনকি পরিশিষ্ট অংশে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। 'ভাসান' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে গায়ানরীতিতে। আখ্যানে ভুবন, সন্নদি, মানদা, দয়ালবাবু সহ পার্শ্বচরিত্রগুলি বড় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'ভাসমান' উপন্যাসের ক্ষিতীশ, সতীশ, রুদ্রপ্রসাদ চরিত্রগুলি লেখক স্বভূমি থেকেই উঠিয়ে এনেছেন। বর্ণনার গুণে ও স্বভূমির মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কনে উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নলিনী বেরার স্মরণীয় উপন্যাস 'শবর চরিত' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। এখনও পর্যন্ত নলিনী বেরার আখ্যানভুবনে সর্বাধিক পৃষ্ঠা সংখ্যার উপন্যাস 'শবর চরিত'। উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪০। চারপর্বে সমাপ্ত। দীর্ঘসময় ধরে লেখক এই আখ্যান রচনা করেছেন। শবর-লোধাদের অতীত-বর্তমানের ভূত-ভবিষ্যৎ, জঙ্গলমহল, সাঁওতাল কুলি মজুরদের জীবনসংগ্রাম, জীবনসংকট, শ্রেণিসংগ্রাম যে ভাষায় ও ভুবনে উপস্থিত হয়েছে তা ক্লাসিকতার দাবি করে। উপন্যাসটির প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন সুব্রত চৌধুরী। উপন্যাসটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। স্বজনভূমির স্বজন-প্রিয়জনদের জীবনচিত্র শেষ করে লেখকের মনে হয়েছিল যেন শবরহারা হলেন। স্বভূমি থেকে বিচ্যুত হলেন। যে স্বভূমি-স্বজনদের তিনি বুকে করে এতকাল বহন করে চলেছেন সেই মানুষদের যেন বুক থেকে নামিয়ে দিলেন। তবে লেখক এখনও স্বভূমির প্রতি দায়বদ্ধ। লেখকের প্রিয় নেশাই হল শবর লোধা পাড়ায় ছুটে চলা। উপন্যাসটি উৎসর্গ করে চুনি কোটালকে। চুনি কোটালের কিছু কবিতা লেখক গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। সেই ঋণ তিনি কৃতজ্ঞচিত্রে স্মরণ করেছেন। এই উপন্যাসের জন্য তিনি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্কিম পুরস্কার'এ ভূষিত হন। উপন্যাসটি চারটি পর্বে বিভক্ত, তবে পরিচ্ছেদ সংখ্যা নেই। পরিচ্ছেদের সূচনায় রয়েছে একটি করে চিত্র। যা পরিচ্ছেদের ভাবনাকে উন্মুক্ত করতে অনেকখানি সহায়ক। প্রথম পর্বে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮, দ্বিতীয় পর্বে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০, তৃতীয় পর্বে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৪, চতুর্থ পর্বে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। আখ্যান শুরু হয়েছে দুটি নরনারীর কথা দিয়ে—রাইবু ও গুড়গুড়িয়া, সমাপ্তি ঘটেছে সাধুবাবা ও সোমবারির সংলাপ দিয়ে। সোমবারির স্পর্শে সাধুবাবার অতৃপ্ত যৌনতা পূর্ণতা পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে রাইবু, শিশুবালার কথা দিয়ে, সমাপ্তি ঘটেছে রাইবু-গুড়গুড়িয়ার প্রসঙ্গ দিয়ে। তৃতীয় পর্বের শুরু হয়েছে রাইবুর প্রসঙ্গ দিয়ে, সমাপ্তি ঘটেছে লোধাপাড়ার প্রসঙ্গকে সামনে রেখে। চতুর্থ পর্বের সূচনা হয়েছে লোধাদের কথা দিয়ে, সমাপ্তি ঘটেছে নামালিয়া লোধাদের কথা দিয়ে। আখ্যানের সমাপ্তবিন্দু বড় চিত্তকর্ষক। নামালিয়া লোধা অর্থাৎ যারা মজুরি খাটতে নিম্নপ্রদেশে যায়। সেই প্রদেশ থেকে ফিরেছে লোধারা। আজ ফিরেছে নুকুও। বড় আশা আজ দেখা হবেই। কিন্তু দেখা হয়েছিল কি না তা আমরা জানি না। জানার অবকাশও রাখেননি লেখক। শুধু দেখা হবে এই আশায় আখ্যানের ইতি টেনে দিয়েছেন—

> "নারদার মোড়ে বাসটা থেমে গেলে বাস থেকে ঝপ্ করে নেমে পড়ল নুকু। ছাতা খুলল, ফের নুনগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এক-দু মিনিট বাদে থেমেও গেল। ওবেলা এখানেই বাস থেকে নেমেছিল নামালিয়া লোধারা। এখন নামল নুকু। সেদিন একটুর জন্য দেখা হয়নি, দেরি করে ফেলেছিল সে।
>
> আজ তাদের সঙ্গে তার দেখা তো হবেই হবে। এখন শুধু দেখার—কোন্দিকে গেল 'সে'?"[২০]

'অপৌরুষেয়' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন দেবাশিস সাহা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন দেবেশ রায়কে। উপন্যাসটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রতিটি পরিচ্ছেদ আবার উপ পরিচ্ছেদে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। নলিনী বেরা প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে কথাভুবন সাজিয়েছেন সর্বত্রই। ব্যতিক্রম নয় এই উপন্যাসও। হিজড়ে আনন্দীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কথাভুবন। সমাজের মূলস্রোত থেকে অনেকটাই দূরে এই হিজড়েদের অবস্থান। শিক্ষা, সংস্কৃতির গুণে আজ কিছুটা বক্রদৃষ্টি লঘু হলেও একসময় এদেরকে অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছিল। এদের না ছিল শিক্ষার অধিকার, না ছিল ভোটদানের অধিকার। সমাজ সর্বত্রই এদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত। সেই সমাজের যন্ত্রণা লেখক আনন্দীর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। আখ্যানের শুরুতেই সেই ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে। কিন্তু জীবনসংগ্রামে আনন্দী পলাতক নয়। বরং বলা ভালো লেখক তাকে জিতিয়ে দিয়েছেন। আখ্যানের শেষে আনন্দী পাড়ি দিয়ে চলেছে এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে। সে চিত্র বড় মধুর, বড় সংগ্রামময় কিন্তু আনন্দজনক, যেন জয়ের গন্ধ লেগে আছে—

> "কান খাড়া করে আনন্দী আরেকরকম গানও শুনল—ঢুপ-ঢুপ! ছন্নছাড়া একা একাই গেয়ে চলেছে—ইস, বাঁউড়িরাতেও অভাগা হতভাগা 'কুমহারের' কাজের বিরাম নেই। হাঁড়ি-কুঁদা পিটে চলেছে—ঢুপ-ঢুপ! আনন্দীরও অবসর আছে নাকি? 'মকর' যাবে, 'মকর-জাত'ও একদিন শেষ হবে। হাঁস-মুরগির খাঁচা কাঁধে আনন্দী আবার রওনা দেবে গোলবাজার। গোলবাজার, গোলবাজার। গোলবাজার থেকে সে গাঁয়ে ফিরবে, গাঁ থেকে গোলবাজার—আবার—আবার—"[২১]

নলিনী বেরার 'কুসুমতলা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন দেবাশিস রায়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন সহলেখক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে। প্রসঙ্গত বলা যায় নলিনী বেরার মতো ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় একই জীবনের কথাকার। কিন্তু ভূগোল আলাদা। নলিনী বেরা যেখানে মেদিনীপুর সহ ঝাড়খণ্ড সন্নিহিত অঞ্চল সেখানে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় বেছে নিয়েছেন সুন্দরবন সহ বাদা অঞ্চল। নলিনী বেরার আখ্যানে শবর, লোধা, সাঁওতাল মানুষের আনাগোনা, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের আখ্যানবিশ্বে মৎসজীবী, ফুলচাষি মানুষের প্রাধান্য। আলোচ্য গ্রন্থে আটটি গল্প রয়েছে। নাম গল্পের নামেই গল্পগ্রন্থের নামকরণ করেছেন লেখক। গল্পগুলি হল—'কুসুমতলা', 'দু'কান কাটা', 'ভাদুতলার ভূত ও রূপার নাকছাবি', 'চিড়কিন্‌ডাঙা', 'ডারউইনের কান্না', 'আমরা সন্ত্রাসবাদীরা' 'ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কাক', 'গুনদশা আমেরশেকেরা ল্যাবরেটরি'। প্রতিটি গল্পেই জন্মভূমির মানুষ-প্রকৃতি-সংস্কার-বিশ্বাস নিয়ে হাজির হয়েছে। বর্ণনা ও স্বাদু গদ্যে স্বভূমির মানুষদের প্রতি আন্তরিকতার গুণে ছোটো ছোটো ঘটনাগুলিও মনের রেখায় দাগ রেখে যায়।

'শবর চরিত'এর পর নলিনী বেরার বিরাট উপন্যাস 'অমৃত কলস যাত্রা' প্রকাশিত হয় ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে উপন্যাসটি 'দৈনিক নিউজবাংলা সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেন রঞ্জন দত্ত। উপন্যাসে বহু পরিচ্ছেদ রয়েছে, কিন্তু পরিচ্ছেদ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়নি। তবে পরিচ্ছেদের সূচনায় একটি করে অলংকরণ রয়েছে। যা উপন্যাসকে বোঝার পক্ষে অনেকখানি সহায়ক। এমনকি পরিচ্ছেদগুলি কতগুলি বিভাগে বিভক্ত, যেগুলি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন আরতি পালিতকে। উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে লেখা রয়েছে—'ফেরার গাড়ি 'দুন এক্সপ্রেস'-এ যে প্রৌঢ়া মাতৃস্নেহে আমাদের সকালের 'জলখাবার' শুকনো মুড়ির উপর নিজের পোঁটলা থেকে বের করে নিজহাতে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন কাঁচা কড়াইশুঁটির দানা—বর্ধমানের কৃষ্ণসায়রের সেই শ্রীময়ী আরতি পালিতের করকমলে—'। উৎসর্গপত্রের বিবরণ থেকেই উপন্যাসের ভূগোল পাঠকের কাছে স্পষ্ট ধরা দেবে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় গঙ্গাসাগরে ভ্রমণ নিয়ে ইতিপূর্বেই সমরেশ বসু লিখেছেন 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। সে আখ্যান গত শতকের। আর এই আখ্যান এই শতকের। ফলে গঙ্গাসাগরের বিবর্তনের ছবি মহাকালের রেখায় চিহ্নিত হয়েছে। শত সহস্র মানুষ, জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পূণ্যতীর্থে পূণ্য অর্জন করতে চলেছে। লেখক একজন সহযাত্রী হয়ে সেই জীবনের ছবি দেখেছেন, যা একঅর্থে একবিংশ শতকের ভারততীর্থের খণ্ডচিত্র ফুটিয়ে তোলে।

'ঝিঙেফুল কাঁকুড়ফুল' গ্রন্থটি ১৪২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন মনীষ দেব। গ্রন্থের অলংকরণ করেন সম্মোহন দে। গ্রন্থটি বিজলী ঘোষকে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থটি চারটি নভলেটের সমষ্টি—'নষ্টকীর্তন', 'নওটংকি', 'ছোট পিসিমা ও আমাদের একান্নবর্তী পরিবার' ও 'বৈশাখীর চর ও একটি জলোদ্ভব দেশ'। 'নষ্টকীর্তন' নভলেটটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, যদিও সেগুলি চরণ (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়) নামে চিহ্নিত। তৃতীয় চরণে আবার তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যাত্রাদল, হরিনাম সংকীর্তনকে সামনে রেখে লেখক এই আখ্যান গড়ে তুলেছেন। 'নওটংকি' নভলেটে ১২টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। বাসদেও গোপ, নৌরঙ্গীলাল, ফুলমোতিয়া চরিত্রগুলি উজ্জ্বল রঙে চিহ্নিত হয়েছে। 'ছোট পিসিমা ও আমাদের একান্নবর্তী পরিবার' নভলেটে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া ছোট পিসিমাকে সামনে রেখে লেখক নিজের পারিবারিক জীবনের গল্প শুনিয়েছেন। বর্ণনার গুণে ও কাহিনির সরসতায় তা বেশ মনোরম। 'বৈশাখীর চর ও একটি জলোদ্ভব দেশ' নভলেটে আটটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদে আবার সংখ্যা চিহ্ন দ্বারা উপ পরিচ্ছেদ রয়েছে। সুবর্ণরেখা নদীকে সামনে রেখে তীরবর্তী জনজীবনের কথা লেখক আমাদের শুনিয়েছেন। বিশেষ করে মেজকাকার কথা উঠে এসেছে। আখ্যানে নদী এসেছে এইভাবে—

> "নদী এখানে পূর্বগামিনী। তার মানে নিরন্তর বয়ে চলেছে পশ্চিম থেকে পুবে। পুবে, পুবে। আমাদের গ্রামের শিমুলতলার ঘাটে এসে দাঁড়ালে ডাইনে-বাঁয়ে অনেক দূর অব্দি নদী দেখা যায়। ওই তো, তালডাংরা মলতাবনী পাতিনা ছেড়ে দেউলবাড়ে এসে নদী যা একটু বাঁক নিয়েছে। তারপর চলেছে সোজা। থুরিয়ার ওখানে গিয়ে ফের বাঁক নিয়ে দনী ঢুকে পড়েছে লাউদহ কুলবনী কালরুইয়ে। তার উপর রোহিনী চৌধুরানি রুক্মিণী দেবী হাইস্কুলের পাশ দিয়ে বহে যাওয়া ছোট নদী ডুলুং কুস্তড়িয়া হাতিবান্ধির গা ঘেঁষে এসে নবকিশোরপুর-আন্ধারির কাছে মিশে গিয়েছে বড় নদী সবুর্ণরেখায়। বড় নদী ছোট নদী মিলেমিশে একাকার, যেন বা সমুদ্র।"[২২]

নলিনী বেরার 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন রঞ্জন দত্ত। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন স্বপনকুমার অধিকারীকে। উপন্যাসের এটি গুলঞ্চ পর্ব। প্রসঙ্গত স্মরণীয় এই নামেই জ্যোতির্ময়ী দেবী একখানা উপন্যাস লিখেছেন। যদিও সে উপন্যাসে দেশবিভাগজনিত সমস্যা জড়িয়ে আছে। নলিনী বেরার এই আখ্যান এক জনপদজীবনকে সামনে রেখে ট্রাম চলাচলকে কেন্দ্র করে। কলকাতা শব্দের উৎপত্তি থেকে নগর পত্তনের কাল থেকে লেখক স্থান নামের ইতিহাস সঞ্চার করে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হয়ে লেখক কলকাতা, হাওড়া সন্নিহিত জনপদজীবনে পৌঁছেছেন। উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ডকু নভেল। একটি ট্রামকে কেন্দ্র করে জনপদজীবন কীভাবে বেঁচে থাকে, কত কোলাহল, কত চাঞ্চল্য, কত দোদুল্যমানতা লেখক সবই এনেছেন। নলিনী বেরার আখ্যানের বড় বৈশিষ্ট্য হল টেক্সটের ভিতর বহু উদ্ধৃতি, ভিন্ন লেখক, পুরাণ, লোকায়ত পুরাণ, ছড়া, ধাঁধাকে সামনে রেখে আখ্যানকে গতিদান করা। ব্যতিক্রম নয় এই আখ্যানও। এই আখ্যান শেষ করেছেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। আখ্যানের সমাপ্তিতে এই উদ্ধৃতি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

> "এদিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠলো '১৫ই কার্তিক
> মরা ফিরবে।'... দুর্গোৎসবের সময়ে সন্ধিপূজোর
> ঠিক শুভক্ষণের জন্য পৌত্তলিকেরা যেমন প্রতীক্ষা
> করে থাকেন, ডাক্তারের জন্য মুমূর্ষু রোগীর
> আত্মীয়েরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয়
> ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটীর দিন প্রতীক্ষা করেন—
> বিধবা ও পুত্রসহোদরাবিহীন নির্ব্বোধ পরিবেররা
> সেই রকম ১৫ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা করেছিলেন।"[২৩]

নলিনী বেরার 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' প্রকাশিত হয় ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন দেবাশিস সাহা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন দেবেশ রায়কে। প্রথম গল্প 'ভূতজ্যোৎস্না', শেষ গল্প 'ঘবা, তিহা-র গল্প'। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল—'কুসুমতলা', 'আমরা সন্তাসবাদীরা', 'ঝরাপালকের জাদু', 'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের', 'মানুষরতনেরা', 'অপারেশন পাঁচকাহিনা', 'বাবা কাকাদের মা', 'অঙ্গনওয়াড়ি', 'এক মিনিট নীরবতা', 'আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ', 'হারমোনিয়াম' ও 'বাবার স্মৃতি'। নলিনী বেরার প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সেরা পঞ্চাশটি' গল্প অবশ্যই জ্ঞাতব্য। বিচিত্র জীবনসত্য গ্রন্থখানিতে প্রাধান্য পেয়েছে। পারিবারিক পটভূমি সহ, জন্মভূমির স্মৃতি, স্বজন-প্রিয়জন সহ স্বভূমির মানুষের জীবনযুদ্ধ, নিম্নবিত্ত-নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনযুদ্ধ, লোকায়ত পরিসর, বিশ্বাস-সংস্কারের দোলা, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ মাওবাদী আক্রমণ, জীবনের সাত-সতেরো নানাভাবে ফুটে উঠেছে। স্বভূমির গোটা সমাজকেই চিহ্নিত করা যায় গ্রন্থখানির মধ্য দিয়ে। অসাধারণ সব গল্প। জীবনকে এমন ফ্রেমে রেখে, দরিদ্র্যের সত্য সুরেলা তারে এমনভাবে তিনি বাজিয়েছেন যা পাঠককে মুগ্ধ করে।

নলিনী বেরার 'মাটির মৃদঙ্গ' উপন্যাসটি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে উপন্যাসটি 'একুশ শতক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ শিল্পী দেবাশিস সাহা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'ময়ুরভঞ্জের চিতরড়া গ্রামের প্রিয় ওড়িয়া বন্ধু শ্রীঅন্তর্যামী বেহেরোরকে'। গ্রন্থটি আটটি পরিচ্ছেদে বিন্যাস্ত। পৃষ্ঠা ২২৪। প্রথম ছয় পরিচ্ছেদে কুম্ভকার সমাজের কথা। সপ্তম-অষ্টম পরিচ্ছেদে সাঁওতাল-কুম্ভকার সমাজের চিত্র এসেছে। প্রথম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এক ওড়িয়া কন্যার একটি বাক্যকে সামনে রেখে বাছুরখোঁয়ার গ্রামে যে উত্তাল ঢেউ নেমে এসেছিল সেই কথা, সপ্তম-অষ্টম পরিচ্ছেদে সাঁওতাল কন্যা বুধনীর সঙ্গে কুম্ভকার সন্তান আশুতোষের প্রেম সমস্যাকে সামনে রেখে সামাজিক দ্বন্দ্ব বড় হয়ে উঠেছে। স্পষ্টত বলা যায় দুটি নারীকে সামনে রেখে স্তিমিত কুম্ভকার গ্রাম কীভাবে জেগে উঠেছিল তা ব্যক্ত হয়েছে। তবে ব্যক্তির বিদ্রোহ আছে। প্রথমদিকে শ্রীনিবাস, শেষদিকে আশুতোষের বিদ্রোহ সামাজিক পরিসর ভেঙে নতুন কাঠামোয় নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা আছে। সুবর্ণরেখানদী তীরবর্তী কুম্ভকার সমাজ যারা প্রাকৃতিক

সম্পদের (মাটি, কাঠ) উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনধারণ করে সেই সমাজের ট্রমা, সামাজিক গঠন, যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকা সমস্ত মিলে এক জনজীবনের কাব্য হয়ে উঠেছে আখ্যানটি।

'শবর চরিত' উপন্যাস লেখককে একটা বড় পরিচয় এনে দিয়েছিল, আর 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাস গোটা বঙ্গের মানুষদের কাছে লেখকের পরিচয় শিরোধার্য করে তুলল। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। আনন্দ পুরস্কার পায় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। আনন্দ পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই চারটি সংস্করণ প্রকাশিত করতে হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে, তৃতীয় সংস্করণও হয় সেই মাসেই। একটি উপন্যাসের এই জনপ্রিয়তা সত্যি বাংলা ভাষা সাহিত্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটা সদার্থক দিক। উপন্যাসটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেন দেবেশিস সাহা। লেখক উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন লেখিকা নবনীতা দেবসেনকে। উপন্যাসটি অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। আনন্দ পুরস্কার ঘোষিত হয় ১৪২৬ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ এবং পুরস্কার প্রদান করা হয় ১৩ই বৈশাখ। পুরস্কার প্রদান করেন কৃষ্ণা বসু। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত মহাভারতের একটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দিয়ে। বঙ্গানুবাদটি হল— 'পুলস্ত্য কহিলেন, 'হে রাজন্! আমি যে সমস্ত অধিগম্য ও অগম্য তীর্থের কীর্ত্তন করিলাম, আপনি সকল তীর্থ দিদৃক্ষায় মনদ্বারা সেই সকল স্থানে গমন করিবেন।' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ কোনো ভূমিকা ছিল না। আনন্দ পুরস্কার পাবার পর লেখক যে অভিভাষণ দেন তা উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ থেকে যুক্ত হয়। লেখকের জীবনসমীক্ষা, লেখনশৈলী ও নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনকথনের বিন্যাসে অভিভাষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিজেও যেন সেই প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি হয়ে প্রান্তিক মানুষের লড়াই সংগ্রামকেই জয়ী করতে চেয়েছেন। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী জনজীবন থেকে যে লড়াই শুরু করেছিলেন এবং মানুষকে সাহিত্যে তুলে আনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, এই পুরস্কারের মধ্য দিয়ে সেই প্রান্তিক মানুষগুলিকেই যেন জয়ী করা হল। লেখকের বক্তব্য কিছুটা উল্লেখ করা যাক—

> "আজ আমি '১৪২৫ বঙ্গাব্দের আনন্দ পুরস্কার'-এ ভূষিত হলাম। পুরস্কার সতত সুখের। আনন্দের ও গৌরবের। কিন্তু এবছরের এই বিশেষ পুরস্কারটি আমার কাছে অধিক গৌরবের। এই কারণে যে, এই পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে আমরাই চর্চিত সেই সমস্ত অন্ত্যজ, অপাঙ্‌ক্তেয় ও তথাকথিত 'সাবলটার্ন' মানুষদেরই যেন জয়যুক্ত করা হল। এ জয় আমার নয়, এ জয় তাঁদেরই। আমার কাছে এর চেয়ে বড় আনন্দ সংবাদ আর কী হতে পারে!"[২৪]

আখ্যান শুরু হয়েছে সেই সুবর্ণরেখা তীরবর্তী বাছুরখোঁয়াড় গ্রামের পারিবারিক পরিসরকে সামনে রেখে। যা নলিনী বেরার আখ্যানে নানাভাবে আগেই এসেছে। আসলে তিনি একই কাহিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারবার আনেন। সত সহস্রভাবে জন্মভূমির কথা যেন বলতে চান। তা যেন কিছুতেই শেষ হয় না। তাই ক্লান্তিহীনভাবে আবার সেই জনজীবনের সত্যের কাচেই ফিরে যান। নলিনী বেরার 'উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি' গ্রন্থটি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন শিবানী মাইতি। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন সুবলচন্দ্র দে'কে। নলিনী বেরা প্রবন্ধ লেখেন কম। যদিও জীবনে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। সেইসব প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভক্ত—'আরেন্দা বারেন্দা সুবর্ণ চুড়ি' ও 'উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি'। প্রথম পর্বে প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি হল 'যে জীবন 'মিথে'র, যে 'মিথ' জীবনের', 'বাংলা গল্প উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ', 'শাল-পিয়াল-কেঁদ-ভুড়রু', 'সাহিত্যে নিম্নবর্গ', 'প্রান্তভূম ব্রাত্যজন কথা', 'বিনয় মজুমদারের গল্প', 'তিতাস ও সুবর্ণরেখা', 'অমিয়ভূষণের গল্প' ও 'প্রান্তজনের ভ্রান্ত অধিকার'। রোদন ও কাঁদনা গীত সংগ্রহ থেকে লেখক 'উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি' পদ সংকলন করেছেন। সাহিত্যের ভুবন কিভাবে ছড়িয়ে পড়ল সে সম্পর্কে 'প্রান্তভূম ব্রাত্যজন কথা' প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। নগর কলকাতা যে বাংলা প্রদেশের সম্পূর্ণ নয়, সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিসরের জন্য অপেক্ষা করে আছে জেলার অন্যপ্রদেশগুলি, যা বহুকাল অকথিত ছিল, সত্তর পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু লেখক প্রবলভাবে সেই জীবনের কথা উঠিয়ে আনলেন, সে সম্পর্কে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে একটি মন্তব্য তুলে ধরি, যা প্রান্তিক ও প্রান্তিক জীবনের সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

> "কিন্তু ততদিনে বিদেশি গল্প-উপন্যাসের আড়া-ধারা অবলম্বনে রচিত আমাদের বাংলা গল্প-উপন্যাসের স্বর্ণযুগ। এমনকী সাহিত্যে নোবেলও আমাদের হাতমুঠোয়! নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয় বৈকি। তবুও প্রশ্ন জাগে—কী হল 'দুয়ো' হয়ে যাওয়া আমাদের সেই সমস্ত খাঁটি ও দেশজ আঞ্চলিক সাহিত্য চর্চার? যা ছিল এতদিন সাহিত্যচর্চার প্রধান ধারা, লোকায়ত ধারা—তা কী একেবারে হারিয়ে গেল? নাকি পাশাপাশি ক্ষীণস্রোতা তটিনী হয়ে বইতে থাকল?"[২৫]

নলিনী বেরার 'পাঁচকাহানিয়া' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছেদ অঙ্কন করেন দেবাশিস সাহা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'দে'জ পাবলিশিং'এর শুভঙ্কর দে'কে। উপন্যাসটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। লেখক জানিয়েছেন 'পাঁচকাহানিয়া' কোনো গ্রামের নাম নয়, এটি একটি জঙ্গল। ফরেস্টের বীট অফিস। নানা মানুষ, পশুপাখি, গাছ, পতঙ্গ, লোকায়ত উৎসব নিয়ে এই জঙ্গলমহল। গাছের মধ্যে আছে শাল, বাঁশ, আমা, জাম, বেল, কুসুম, নিম, শিরিশ ইত্যাদি। লোকায়ত উৎসবের মধ্যে রয়েছে করম, কার্মাম, সহরায়, বাদনা, গোরোয়া, গোহালপূজা, পৈড়ান গাড়া, পৈড়ান ওঠা ইত্যাদি। গ্রামগুলি হল—মূঢ়াকাটি, চঁদরপুর, চেঙ্গামারা, ঢেঙ্গাসোল, কুড়চিবনী, বালিগেড়িয়া, কুল্‌ডিহা ও নয়াগ্রাম। বিবিধ জাতির মানুষের বসবাস। আছে হাতি অত্যাচার। জঙ্গল থেকে নিত্য চলে কাঠ চুরি। সেইসব ইতিবৃত্ত নিয়ে এই আখ্যান বিবর্তিত হয়েছে।

নলিনী বেরার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা :

ক.কবিতা

১. সে জানে শুষনিপাতা ২. কতদূর আছো সুবর্ণরেখা

খ. উপন্যাস

১. ভাসান ২. খালাস ৩. শবরপুরাণ ৪. ইরিণা এবং সুধন্যরা ৫. নাক ফুল ৬. অপৌরুষেয় ৭. ঈশ্বর করে আসবে ৮. হলুদবনের টুসু ৯. যে আছে প্রতীক্ষা করে, ১০. দুই ভবন ১১. ফুলকুসুমা ১২. দালানের পায়রাগুলি ১৩. শালমহুলের প্রেম ১৪. শবরচরিত (১ম) ১৫. শবর চরিত (২য়) ১৬. শবর চরিত (৩য়) ১৭. শবর চরিত (৪র্থ) ১৮. শবর চরিত (অখণ্ড) ১৯. সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা ২০. তিনটি উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে—'অমৃতকলস যাত্রা' দৈনিক নিউজবাংলা সংবাদ পত্রিকায়, একুশ-শতক-এ'মাটিরমৃদঙ্গ'এবং আরম্ভ-তে 'উরালঘুর্ণি'।

গ. শ্রেষ্ঠ গল্প (প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০০৩)

১. বাবার স্মৃতি ২. এই এই লোকগুলো ৩. বরফ পড়া দিনগুলোয় ৪. বাবা-কাকাদের মা ৫. হোমগার্ডের জামা ৬. ঘোড়া ও সর্ষেদানা ৭.শ্রীকান্ত পঞ্চমপর্ব ৮. যৌতুক ৯. ঘবা, তিহা'র গল্প ১০. ভূতজ্যোৎস্না ১১. শীতলামঙ্গল ১২. বর্ষামঙ্গল ১৩. বড়াভাজা, কটা চোখ ও বঙ্কিম বধুকের গল্প। ১৪. শতরঞ্জি ১৫. পুষ্করা ১৬. জলের মানুষ ডাঙার মানুষ ১৭. হাঁসচরা ১৮. আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ ১৯. ভূত ভূত ২০. নৌকাবিলাস ২১. মাছরাঁকা ২২. গ্রামের চিঠি ২৩. বৈকুণ্ঠপুর।

(ঘ) সেরা পঞ্চাশটি গল্প (প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫)

১. ভূতজ্যোৎস্না ২. কুসুমতলা ৩. এই এই লোকগুলো ৪. ধানফুলি মাছ ৫. ঝাঁটার কাঠি ৬. মেখলীগঞ্জ তিস্তাপাড়ে ৭. আমরা সন্ত্রাসবাদীরা ৮.মাছরাঁকা ৯. টিটেনাস ১০. ঘোড়া ও সর্ষেদানা ১১. খোরপোষ ১২. ঝরাপালকের যাদু ১৩. বিবাদী বিল ১৪. জ্যোতির্ময়ের স্বদেশ সন্ধান ১৫. হোমগার্ডের জামা ১৬. নৌকাবিলাস ১৭. আমাকে আমার মতো ১৮. চমকাই টাঁড়ের পিচ্‌ রাস্তা ১৯. যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের ২০. শতরঞ্জি ২১. টি.আই.প্যারেড ২২. মানুষরতনেরা ২৩. ধর্মের গাড়ু ২৪. খরগোশ ২৫. বরফপড়া দিনগুলোয় ২৬. অপারেশান পাঁচকাহিনা ২৭. ছেড়া কুড়চির মালা ২৮. চিড়িতনের উল্কি ২৯. আজাদী ৩০. জলের মানুষ ডাঙার মানুষ ৩১. হাঁসচরা ৩২. বাবা কাকাদের মা ৩৩. ভগ্নদূত ৩৪. আসা চাই ৩৫. নুয়াসাহীর বটতলা ৩৬. সুমন্তর বাড়ি ৩৭. অঙ্গনওয়াড়ি ৩৮. ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কাক ৩৯. চারআনা আটআনার প্রেম ৪০. পুষ্করা ৪১. বাঘাতঙ্ক ৪২. বৈকুণ্ঠপুর ৪৩. হারমোনিয়াম ৪৪. বাবার স্মৃতি ৪৫. হাতিডহর ৪৬. বোরজ ৪৭. এক মিনিটের নিরবতা ৪৮. আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ ৪৯. মহাপ্রস্থানের পথে অথবা ছোট বকুলপুরের যাত্রী ৫০. ঘবা, তিহার গল্প।

পুরস্কার : নির্মল আচার্য পুরস্কার, গল্পমেলা পুরস্কার, শোপান, একলব্য, উপত্যকা, লোককৃতি, বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার, সংবাদপ্রতিদিন ও বর্ণপরিচয় যৌথভাবে ছোটগল্পের জন্য শারদ সম্মান। এছাড়াও বহু প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা পেয়েছেন এবং সঙ্গে অসংখ্য পাঠকের ভালোবাসা।

তথ্যসূত্র :

১. বেরা, নলিনী, সাক্ষাৎকার, তাং-২৫.০২.২০১৬
২. বেরা, নলিনী, সাক্ষাৎকার, তাং-২৫.০২.২০১৬
৩. বেরা, নলিনী, সাক্ষাৎকার, তাং-১৫.০৪.২০১৬
৪. বেরা, নলিনী, সাক্ষাৎকার, তাং-১০.০৯.২০১৬
৫. বেরা, নলিনী, সাক্ষাৎকার, তাং-১০.০৯.২০১৬
৬. বেরা, নলিনী, সাক্ষাৎকার, তাং-১০.০৯.২০১৬
৭. বেরা, নলিনী, শ্রেষ্ঠগল্প, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমারলেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০০৩, পৃ. XX
৮. তদেব, পৃ. XXI
৯. বেরা, নলিনী, সাক্ষাৎকার, তাং-১০.০৯.২০১৬
১০. বেরা, নলিনী, শ্রেষ্ঠগল্প, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমারলেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০০৩, পৃ. XXII
১১. তদেব, পৃ.XXIII
১২. তদেব, পৃ. ১০
১৩. তদেব, পৃ. ১০
১৪. তদেব, পৃ. ১০
১৫. তদেব, পৃ. ১১
১৬. তদেব, পৃ. ১১
১৭. তদেব, পৃ. ১১
১৮. বেরা, নলিনী, সাক্ষাৎকার, তাং – ১০.০৯.২০১৬
১৯. বেরা, নলিনী, সুবর্ণরেখা, সে জানে শুশনি পাতা, মহুল প্রকাশনী, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৫ , পৃ.৮২
২০. বেরা, নলিনী, শবর চরিত,অখণ্ড সংস্করণ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা -৯ , পৃ. ৭৪০
২১. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯৬
২২. বেরা, নলিনী, বৈশাখীর চর ও একটি জলোদ্ভব দেশ, ঝিঙা ফুল কাঁকুড় ফুল, গল্পসরণি, কলকাতা- ২৮, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৪২০, পৃ. ১২৩
২৩. বেরা, নলিনী, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৫১
২৪. বেরা, নলিনী, আনন্দ পুরস্কার (১৪২৫) প্রাপকের অভিভাষণ, সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেণু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯
২৫. বেরা, নলিনী, প্রান্তভূম ব্রাত্যজন কথা, উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯ পৃ. ৬৮